সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর: প্রসঙ্গ বহুবিবাহ

সারসংক্ষেপ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০- ১৮৯১) সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হলো বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে রামমোহন রায়, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী, খ্রিস্টান মিশনারীরা এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পুরুষদের তথা কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন জনসচেতনতা গড়ে তুলতে। আবার অনেকেই এসময় কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করবার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংঘটিত বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বালবিধবা কুলীন নারীদের দুঃখে কাতর বিদ্যাসাগর সহৃদয়তার সঙ্গে এই কুপ্রথা বন্ধ করবার জন্যে কখনো বই লিখেছেন, আবার কখনো বহুবিবাহের বিরুদ্ধে অনেক প্রগতিশীল মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন পত্র ইংরেজ সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের কর্মতৎপরতায় এবং ক্ষুরধার লেখনীগুণে কীভাবে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল তার পর্যালোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: সমাজসংস্কার, কৌলীন্যপ্রথা, বিবাহ ব্যবসায়ী, বহুবিবাহ, কুলীন ব্রাহ্মণ, কুলীন নারী, ব্রিটিশ সরকার।

লেখক

ড. তুফান রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কুশমণ্ডি সরকারি মহাবিদ্যালয়, কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
roytufan9@gmail.com

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

মূল প্রবন্ধ

শৈশবে অ,আ,ক,খ তথা *বর্ণপরিচয়*-এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। তারপর বেড়ে ওঠার সংগে সংগে সমাজসংস্কারক করুণার সাগর বিদ্যার সাগরের পরিচয় আমরা পাই। আমরা জানি উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ফলে যে সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলি সংঘটিত হয়েছিল, তার অধিকাংশ আন্দোলনই ছিল নারীকেন্দ্রিক। আবার উনিশ শতকের নারীকেন্দ্রিক তথা নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই বিদ্যাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাই একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, বিদ্যাসাগরের নানাবিধ পরিচয়ের একটা বড়ো পরিচয় সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর হিসেবেই। এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-"ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কার ও সমাজপুনর্গঠনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা মূলতঃ সমাজবিপ্লবীর ভূমিকা। টুলো পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এবং সংস্কৃত কলেজের পুরাতন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় লালিত হয়েও বিদ্যাসাগর প্রথম শ্রেণীর সমাজসংস্কারক হিসেবেই এদেশে পরিচিত হয়েছেন। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ নিরোধের চেষ্টায় এই ব্রাহ্মণসন্তান ক্ষত্রিয়োচিত মানসিক বলবীর্যের যে পরিচয় দিয়েছেন, সারা ভারতবর্ষেই তার জুড়ি মেলে না,- না সেযুগে, না এযুগে।"[১] - তাই আমরা দেখি বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলেও সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগর কিন্তু আগ্রহ হারাননি। বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলে বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন যে, এদেশে বালবিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মূলত কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকায়। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এদেশে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হলে সমাজে বিধবাদের সমস্যার কোনোদিনই নিষ্পত্তি হবে না। কাজেই বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করবার আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

প্রাচীনকালেও এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। তবে এক্ষেত্রে কিছু শর্তাবলী প্রযোজ্য ছিল। যেমন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের লিখিত সংবিধান বলে বিবেচিত *মনুসংহিতা*-য় মনু পুরুষের পুনর্বার বিবাহের যে শর্ত দিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে রণদীপম বসু মনুর বচন উদ্ধৃত করে লিখেছেন-

" 'বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী।।'

নারী বন্ধ্যা হলে আদ্য ঋতুদর্শন থেকে অষ্টম বৎসরে অন্য একটি বিবাহ করবে, মৃতবৎসা হলে দশম বৎসরে, কেবল কন্যাসন্তান প্রসব করতে থাকলে একাদশ বৎসরে এবং অপ্রিয়বাদিনী হলে সদ্য সদ্যই অধিবেদন করবে অর্থাৎ অন্য বিবাহ করবে। (মনু-৯/৮১)"[২] – আর এক্ষেত্রে মনু পুরুষের পুনর্বার বিয়ে করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিচু বর্ণের নারীকে বিয়ে করার বিধান দিয়েছেন। এবং মনুর বিধান অনুযায়ী পুরুষেরা উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়া ইচ্ছেমতো বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু কৌলীন্যপ্রথার ফলে বিশেষত দেবীবরের মেলবন্ধনের ফলে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। কুলীন ব্রাহ্মণেরা অনেকেই কুলীন নারীর কুল উদ্ধারের নামে অনেক টাকা বরপণের লোভে শতাধিক সবর্ণ বিয়ে করতেও পিছপা হতো না। আর এভাবেই উনিশ শতকে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ বিবাহ ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে আবার কুলীন কন্যার পিতা কখনো অলীক কুল উদ্ধারের নামে বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন পাত্রের সঙ্গে, আবার কখনো উপযুক্ত কুলীন পাত্র না পেয়ে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ কুলীন পাত্রের সঙ্গেও নিজের বালিকা কন্যাকে বিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করতো না। আর কুলীন ব্রাহ্মণেরা যেহেতু তাদের স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতো না সেহেতু কুলীন নারীদের আজীবন স্বামীসঙ্গ ব্যতিরেকে পরের আশ্রয়ে ঘৃণা-অপমান-তাচ্ছিল্য

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

সহ্য করে জীবন-যাপন করতে হতো। আবার অনেক সময় বালিকা কুলীন নারীদের মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষু কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় অবধারিত বৈধব্যের শিকার হতে হতো নিতান্ত বাল্যকালেই। এভাবে উনিশ শতকে এদেশে কৌলীন্যপ্রথার ফলে বালবিধবা নারীর সংখ্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন নারীরা স্বামীসঙ্গ ব্যতিরেকে, কিংবা বাল্যকালে বিধবা হওয়ায় অনেক সময়ই জৈবিক তাড়নায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। ফলস্বরূপ ভ্রূণহত্যার মতো মহাপাপ কুলীন নারীদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সেকালের সংবাদপত্রগুলিতে। যেমন, ৪ জুলাই ১৮৩৫ সালের *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক পত্রলেখকের পত্রে এরকম ঘটনার উল্লেখ রয়েছে-"ধর্ম্মলোপের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বিদিত করিতে সঙ্কুচিত হইয়া লিখিতেছি যে এক ব্যক্তি হইতে বহু স্ত্রীর মনোভিলাষ কোনরূপেই পূর্ণ হইতে পারে না ইহাতে ঐ কুলীনের স্ত্রী প্রায়ই পরপুরুষরতা হইয়া জারজ সন্তান উৎপন্ন করিতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত অবিবাহিতা স্ত্রীরা যৌবনযন্ত্রণায় কাতরা হইয়া পরাসক্তাতে তাহারদের গর্ভ হইতেছে। যদ্যপিও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া এই কর্ম্ম করে কিন্তু ঐ সকল সন্তান রাখিলে কুল সমূলে বিনাশ পায় প্রযুক্ত ঐ পঞ্চম ষষ্ঠ অষ্টমমাসীয় জীবদিগকে অস্ত্রাঘাতে অথবা অন্য কোন উপায়ান্তরে নষ্ট করে যাহাতে ভ্রূণহত্যা মহাপাতক উৎপত্তি হইতেছে।"[৩]-এভাবে কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের কারণে কুলীন নারীদের একদিকে যেমন আজীবন পরের আশ্রয়ে তাচ্ছিল্য-অপমান সহ্য করতে হতো, অন্যদিকে জৈবিক তাড়নায় অনেকেই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ভ্রূণ হত্যার মতো মহাপাপে পতিত হতো। সুতরাং আলোচনা করে দেখা গেল, উনিশ শতকে এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের বহুবিবাহের ফলে নারীদের দুর্দশা মূলত কুলীন নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা উনিশ শতকে এদেশের রক্ষণশীল সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য বর্ণের পুরুষেরা পুনর্বার বিয়ে করতে পারলেও সেক্ষেত্রে কিছু শর্ত ছিল। কিন্তু কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বিনা শর্তে কুলীন কন্যাদের কৃত্রিম কুল উদ্ধারে নামে একাধিক, আবার কখনো শতাধিক বিয়ে করতেও পিছপা হতো না। তাই উনিশ শতকে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন মূলত সংঘটিত হয়েছিল কৌলীন্যপ্রথাকে কেন্দ্র করে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের ফলে। স্বাভাবিকভাবেই এসময় যাঁরা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা সকলেই কৌলীন্যপ্রথাকে আক্রমণ করে যুক্তি দিয়ে কৌলীন্যপ্রথার অনিষ্টকারিতা দেখিয়েছিলেন এবং এটি যে অশাস্ত্রীয় জনগণকে তা বোঝাতে চেয়েছিলেন।

রামমোহন রায় সতীদাহ সমস্যার কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বহুবিবাহ সমস্যার কথাও তুলে ধরেছিলেন। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের ফলে কুলীন নারীদের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছিলেন *সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮১৯ খ্রি.) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের ফলে কুলীন নারীদের আজীবন পরের আশ্রয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-অপমান সহ্য করে জীবন কাটানোর চিত্রকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি কৌলীন্যপ্রথার অবসান ঘটিয়ে কুলীন নারীদের দুরবস্থা মোচনের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন যে, যদি এক স্ত্রী বর্তমানে কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায় তাহলে তাকে শাস্ত্র নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী করতে হবে। এবং এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর অনুমতি নিতে হবে। এভাবে বিদ্যাসাগরের বহুপূর্বেই রামমোহন রায় এদেশের বহুবিবাহ সমস্যার সমাধানের কথা ভেবেছিলেন। আবার ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী বিধবাবিবাহ সমস্যা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বহুবিবাহ সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। ইয়ংবেঙ্গলরা কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের সমালোচনা করে বিভিন্ন সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় *এনকোয়ারার* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীনদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল বা নব্যবঙ্গদের আরেকটি পত্রিকা *জ্ঞানান্বেষণে* ১৮৩৬ সালে ২৭ জন বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণের নাম-পরিচয় সহ তাদের বিবাহ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে

আবার কয়েকজনের বিবাহের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। এর মধ্যে দিয়ে ইয়ংবেঙ্গলরা দেখাতে চেয়েছিলেন সেসময় কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারীরাও কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন। মিশনারীদের পক্ষ থেকে ক্লডিয়াস বুকানন কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন নারীদের দুরবস্থার কথা আলোচনা করেছিলেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য কয়েকটি পত্রিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। *সমাচার দর্পণ* পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সম্পাদককে লেখা সাধারণ মানুষের বিভিন্ন চিঠি-পত্র মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছিল এবং রক্ষণশীলদের বহুবিবাহকে টিকিয়ে রাখার ভ্রান্ত প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করেছিল। কৌলীন্যপ্রথা যে শাস্ত্রসম্মত নয় এবং তা যে কুলীন নারীদের জীবনের অনিষ্টের মূল তাও *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় বিভিন্ন সময় দাবি করা হয়েছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের *রিফর্মার* পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় অংশে কৌলীন্যপ্রথার অনিষ্টকারিতা দেখিয়ে এই প্রথা নিবারণের জন্যে সরকারের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছিল। সেইসঙ্গে সম্পাদক এও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই প্রথা হিন্দুশাস্ত্র বিরোধী। এযাবৎ বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারে ব্রিটিশ সরকার এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথায় সাধারণত হস্তক্ষেপ করতে চাইতো না জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে বলে। তাই কৌলীন্যপ্রথা নিবারণে সরকার যাতে নির্দ্বিধায় হস্তক্ষেপ করতে পারে সেজন্যে *রিফর্মার* পত্রিকার সম্পাদক কৌলীন্যপ্রথা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ তার উল্লেখ করেছিলেন। আবার *ক্যালকাটা খ্রিশ্চান অবজার্ভার* পত্রিকা কৌলীন্যপ্রথাকে অনৈতিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত বলে দাবি করেছিল এবং এই প্রথা নিবারণের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছিল। এভাবে সেকালের বহু পত্র-পত্রিকা কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করে জনমত গড়ে তুলে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনকে অনেকটাই জোড়ালো করেছিল।

বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৌলীন্যপ্রথার ফলে অনেক সময় বৃদ্ধ কুলীন পাত্রের সঙ্গে অল্পবয়সী কুলীন কন্যার বিয়ে দেওয়ার ফলে সমাজে বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতায় ও অত্যাচারে বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের পরেও যেহেতু বিধবা নারীর বিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না সেহেতু বিধবা নারীর দুঃখ-কষ্ট দূর করার একটা উপায় হচ্ছে কৌলীন্যপ্রথার উচ্ছেদ ঘটনো। এই কৌলীন্যপ্রথার ফলে এদেশের কুলীন নারীরা যে বিবাহিত হয়েও আজীবন পরের আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে নিতান্ত পরিচারিকার মতো জীবন-যাপন করে এবং কখনো কখনো জৈবিক তাড়নায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় সে বিষয়েও বিদ্যাসাগর আলোকপাত করেছেন তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব*-এ (১৮৭১ খ্রি.)। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথাকে এদেশের নারীদের দুরবস্থা ও অনিষ্টের মূল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এ বিষয়ে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং তাঁরা সকলেই এই প্রথা রদ করার সপক্ষে। বিদ্যাসাগরের ভাষায়-"... বহুবিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতিজঘন্য অতিনৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতাপ্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যেসমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, যৎ সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফলতঃ, এতন্মূলক অত্যাচার এত অধিক ও এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র হিতাহিতবোধ ও সদসদ্বিবেকশক্তি আছে, তাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেই এই প্রথার বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়।"[৪] -কিন্তু এসময় রক্ষণশীলরা দাবি করেছিল যে, বর্তমানে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে বলে আইন করে আর বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। মূলত রক্ষণশীলদের এসব কুযুক্তির উত্তর দিতে গিয়েই

বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি রক্ষণশীলদের মতকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য সেসময় হুগলী জেলার ১৩৩ জন কুলীন ব্রাহ্মণদের নাম, বাসস্থান সহ তাঁদের বহুবিবাহের সংখ্যা উল্লেখ করে যে তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, অনেকেই অর্ধশতাধিক বিয়ে করেছেন। এভাবে রক্ষণশীলদের মতকে ভুল প্রমাণিত করে বিদ্যাসাগর লিখেছেন- "হুগলী জিলাতে বহুবিবাহকারী কুলীনের যত সংখ্যা, বধর্মান, নবদ্বীপ, যশর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি জিলাতে তদপেক্ষা ন্যূন নহে; বরং কোনও কোনও জিলায় তাদৃশ কুলীনের সংখ্যা অধিক। কুলীনদিগের বিবাহের যে সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা অধিকসংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না। সুতরাং, অন্যের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নহে।... অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই নির্দেশ করিয়াছি; জ্ঞানপূর্বক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই।"[৫] -আবার রক্ষণশীলরা বহুবিবাহপ্রথাকে শাস্ত্রসম্মত বলে দাবি করেছিল। এর উত্তর দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থে হিন্দু রক্ষণশীলদের যাবতীয় আচার-আচরণ, রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় যে শাস্ত্রের দ্বারা সেই *মনুসংহিতা*-র বচন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, বিনাকারণে একাধিক বিয়ে করা এবং একাধিক সবর্ণ বিয়ে করা *মনুসংহিতা* অনুসারে নিষিদ্ধ। তাহলে কুলীন ব্রাহ্মণেরা কৌলীন্যপ্রথার দোহাই দিয়ে যে অসংখ্য সবর্ণ বিবাহ করে- তা নিঃসন্দেহে মনুসংহিতা বিরোধী। এভাবে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রমাণ করে লিখেছেন- "এ দেশের লোকে, কোনও কালে, কোনও বিষয়ে শাস্ত্রের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলেন না; তাঁহাদের যাবতীয় ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ অনুসারে নিয়মিত; যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, তাহা হইলে, এ দেশের লোকের ব্যবহার- দর্শনে, হয় তা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ সন্দেহ করিলে নিতান্ত অন্যায় হইত না। কিন্তু যখন যাদৃচ্ছিক বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রকারদিগের মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাদৃশব্যবহারদর্শনে, উহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ মীমাংসা করা কোনও মতে সঙ্গত হইতে পারে না। তবে, এদেশের লোক অনেক বিষয়ে শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া থাকেন, সুতরাং বিবাহবিষয়েও তাঁহারা তাহা করিতেছেন, এজন্য তাহা বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না, এরূপ নির্দেশ করিলে, বরং তাহা অপেক্ষাকৃত ন্যায়ানুগত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত।"[৬]

বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকে বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রমাণ করলে অনেকেই এবিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করেছিলেন এবং তাঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। বিদ্যাসাগর বিরোধীদের আক্রমণের উত্তর দিয়ে পুনরায় বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার* (১৮৭৩খ্রি.) গ্রন্থে। এভাবে রক্ষণশীলদের সঙ্গে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে এবং বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে জনমত গড়ে তুলে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ আন্দোলনকে একটা দৃঢ়তা দিয়েছিলেন।

আইন করে বহুবিবাহপ্রথা নিষিদ্ধ করার জন্যে *বন্ধুবর্গ সমবায় সভার* পক্ষ থেকে কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল ১৮৫৫ সালের প্রথম দিকে। এটি সরকারের কাছে প্রেরিত কৌলীন্যপ্রথা নিবারণ করার জন্যে প্রথম আবেদনপত্র। বস্তুত এই আবেদনপত্র পাঠানো হলে রক্ষণশীল সমাজও চুপ করে থাকেনি। এর প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ থেকে রাধাকান্ত দেব বহুবিবাহ প্রথাকে শাস্ত্রসম্মত বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং এই প্রথা উচ্ছেদ করলে হিন্দুধর্ম ও সংস্কারে আঘাত হানা হবে বলে এই প্রথা নিষিদ্ধ না করার জন্যে সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। এরপর ১৮৫৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর আইন করে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্যে সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের পর বিভিন্ন স্থান থেকে বহুবিবাহ রদ করার জন্যে সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠানো হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য- বর্ধমানের মহারাজার আবেদন, নদীয়ার রাজার

আবেদন, কলকাতার অধিবাসীদের আবেদন প্রভৃতি। বস্তুত বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ আন্দোলনের ফলেই এদেশের অনেক প্রগতিশীল মানুষ বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে বহুবিবাহ আইন করে নিষিদ্ধ করার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রস্তাব-আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন।

রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও বহুবিবাহ রদ করার পক্ষে অনেকগুলি আবেনপত্র পেয়ে গ্রান্ট সাহেব বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করতে বিল প্রস্তুত করলেও তা শেষপর্যন্ত আইনে পরিণত হয় নি। কেননা এসময় সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এরকম পরিস্থিতিতে দেশীয় মানুষদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে ভেবে ব্রিটিশ সরকার এদেশে প্রচলিত কোন প্রথায় হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। এছাড়া ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসনের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ধর্মীয় আচার-আচরণ, প্রথা প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করবে না। তাই আইন করে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার সব ব্যবস্থা ঠিক থাকলেও ব্রিটিশ সরকার আর বহুবিবাহ নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করেনি। তবে বহুবিবাহ বিরোধী আইন প্রণীত না হলেও বিদ্যাসাগর কিন্তু এই বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াননি। বরং তিনি শেষ পর্যন্ত বহুবিবাহ বিরোধী আইন প্রণয়নের সপক্ষেই ছিলেন। বহুবিবাহ বিরোধী আইন প্রণয়নে ব্রটিশ সরকারের টালবাহানা উপলব্ধি করে তিনি পরবর্তীকালে বহুবিবাহের কুফল এবং বহুবিবাহ যে অশাস্ত্রীয় তা যুক্তি দিয়ে প্রমান করবার জন্যে বহুবিবাহ বিষয়ক দুটি বই লিখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই দুটি বই লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে সচেতন করা। কাজেই বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনকে আমরা পুরোপুরি ব্যর্থ বলতে পারি না। বিভিন্ন প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ, সাময়িক পত্রে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে যেসব আলোচনা হয়েছে- তা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায়নি। কেননা বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের ফলে দেশীয় মানুষদের মনে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে ওঠে। তাইতো বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকগুলি আবেদনপত্র সরকারের কাছে জমা পড়েছিল। আর আমরা জানি, কোনো কিছু প্রবর্তন কিংবা নিষিদ্ধ করতে আইন প্রণয়নের চেয়ে সবথেকে বেশি প্রয়োজন গণসচেতনতা। কেননা দেশের মানুষ সচেতন না হলে আইন শুধু কাগজে-কলমেই থেকে যায়, বাস্তবে তা কার্যকরী হয় না। বহুবিবাহ রদ আইন প্রণীত না হলেও বহুবিবাহ আন্দোলনের ফলে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে যে গণসচেতনতা গড়ে উঠেছিল, তা থেকেই পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এদেশে পুরুষের বহুবিবাহের সংখ্যা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল।

তথ্যসূত্র

১. ড. অসিতকুমার, বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- শ্রাবণ ১৩৭৭, পৃ. ১৬৬
২. রণদীপম, বসু, মনুশাস্ত্রে নারী ও ব্রাহ্মণ্যবাদ, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ- একুশে বইমেলা ২০২০, পৃ. ১১৮
৩. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ, বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৭০০০০৬, পঞ্চম মুদ্রণ- পৌষ ১৪০১, পৃ. ২৪৯, ২৫০
৪. ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, অখণ্ড সংস্করণ, সম্পাদনা সুবোধ চক্রবর্তী, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা-৭০০০০৯, চতুর্থ সংস্করণ- চৈত্র ১৪১৬, পৃ. ৬৮৮
৫. ঐ, পৃ. ৭১৭
৬. ঐ, পৃ. ৭৪৮

সহায়ক গ্রন্থ

১. ঘোষ, বিনয়, বাংলার নবজাগৃতি, প্রকাশ ভবন, কলকাতা- ৭০০০৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ- বৈশাখ ১৪২৩
২. ঘোষ, বিনয়, যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর, পাঠভবন, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ১৯৬০

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- শ্রাবণ ১৩৭৭
৪. বসু, বিমান (সম্পাদনা), প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি (রাজ্য কমিটি), কলকাতা-৭০০০১৪, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৬০
৫. বসু, রণদীপম, মনুশাস্ত্রে নারী ও ব্রাহ্মণ্যবাদ, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ- একুশে বইমেলা ২০২০
৬. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, রসসাগর বিদ্যাসাগর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ- জুন ২০১৯
৭. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৭০০০০৯, ষষ্ঠ সংস্করণ- অগাস্ট ২০১৬
৮. বসু, স্বপন, সমকালে বিদ্যাসাগর, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৫৯
৯. মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন, বিদ্যাসাগর: নতুন করে জানা অন্য ভাবে চেনা, পুনশ্চ, কলকাতা-৭০০০১০, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০২১
১০. রায়, অলোক, উনিশ শতক, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা- ৭০০০৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০১৭